গল্প

মামলার ফল

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গলিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

মামলার ফল

বুড়া বৃন্দাবন সামন্তর মৃত্যুর পরে তাহার দুই ছেলে শিবু ও শম্ভু সামন্ত প্রত্যহ ঝগড়া-লড়াই করিয়া মাস-ছয়েক একান্নে এক বাটীতে কাটাইল, তাহার পরে একদিন পৃথক হইয়া গেল।

গ্রামের জমিদার চৌধুরীমশাই নিজে আসিয়া তাহাদের চাষবাস, জমিজমা, পুকুর-বাগান সমস্ত ভাগ করিয়া দিলেন। ছোটভাই সুমুখের পুকুরের ওধারে খান-দুই মাটির ঘর তুলিয়া ছোটবৌ এবং ছেলেপুলে লইয়া বাস্তু ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

সমস্তই ভাগ হইয়াছিল, শুধু একটা ছোট বাঁশঝাড় ভাগ হইতে পাইল না। কারণ, শিবু আপত্তি করিয়া কহিল, চৌধুরীমশাই, বাঁশঝাড়টা আমার নিতান্তই চাই। ঘরদোর সব পুরোনো হয়েছে, চালের বাতা-বাকারি বদলাতে, খোঁটাখুঁটি দিতে বাঁশ আমার নিত্য প্রয়োজন। গাঁয়ে কার কাছে চাইতে যাব বলুন?

শম্ভু প্রতিবাদের জন্য উঠিয়া বড়ভাইয়ের মুখের উপর হাত নাড়িয়া বলিল, আহা, ওঁর ঘরে খোঁটাখুঁটিতেই বাঁশ চাই—আর আমার ঘরে কলাগাছ চিরে দিলেই হবে, না? সে হবে না, সে হবে না চৌধুরীমশাই, বাঁশঝাড়টা আমার না থাকলেই চলবে না, তা বলে দিচ্চি।

মীমাংসা ঐ পর্যন্তই হইয়া রহিল। সুতরাং, এই সম্পত্তিটা রহিল দুই শরিকের। তাহার ফল হইল এই যে, শম্ভু একটা কঞ্চিতে হাত দিতে আসিলেও শিবু দা লইয়া তাড়িয়া আসে, এবং শিবুর স্ত্রী বাঁশঝাড়ের তলা দিয়া হাঁটিলেও শম্ভু লাঠি লইয়া মারিতে দৌড়ায়।

সেদিন সকালে এই বাঁশঝাড় উপলক্ষ করিয়াই উভয় পরিবারের তুমুল দাঙ্গা হইয়া গেল। ষষ্ঠীপূজা কিংবা এমনি কি একটা দৈবকার্যে বড়বৌ গঙ্গামণির কিছু বাঁশপাতার আবশ্যক ছিল। পল্লীগ্রামে এ বস্তুটি দুর্লভ নয়, অনায়াসে অন্যত্র সংগ্রহ হইতে পারিত, কিন্তু নিজের থাকিতে পরের কাছে হাত পাতিতে তাঁহার শরম বোধ হইল। বিশেষতঃ তাঁহার মনে ভরসা ছিল, দেবর এতক্ষণে নিশ্চয় মাঠে গিয়াছে—ছোটবৌ একা আর করিবে কি !

কিন্তু কি কারণে শম্ভুর সেদিন মাঠে বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে সবেমাত্র পান্তা-ভাত শেষ করিয়া হাত ধুইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমনি সময়ে ছোটবৌ পুকুরঘাট হইতে উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে সংবাদ দিল। শম্ভুর কোথায় রহিল জলের ঘটি—কোথায় রহিল হাত-মুখ ধোওয়া, সে রৈ-রাই শব্দে সমস্ত পাড়াটা তোলপাড় করিয়া তিন লাফে আসিয়া এঁটো হাতেই পাতা কয়টি কাড়িয়া লইয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে বড়ভাজের প্রতি যে-সকল বাক্য প্রয়োগ করিল, সে-সকল সে আর যেখানেই শিখিয়া থাকুক, রামায়ণের লক্ষ্মণ-চরিত্র হইতে যে শিক্ষা করে নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

এদিকে বড়বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি গিয়া মাঠে স্বামীর নিকট খবর পাঠাইয়া দিল। শিবু লাঙ্গল ফেলিয়া কাস্তে হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিল এবং বাঁশঝাড়ের অদূরে দাঁড়াইয়া অনুপস্থিত কনিষ্ঠের উদ্দেশে অস্ত্র ঘুরাইয়া চীৎকার করিয়া এমন কাণ্ড বাধাইল যে, ভিড় জমিয়া গেল। তাহাতেও যখন ক্ষোভ মিটিল না, তখন সে জমিদার-বাড়িতে নালিশ করিতে গেল এবং এই বলিয়া শাসাইয়া গেল যে, চৌধুরীমশাই এর বিচার করেন ভালই, না হইলে সে সদরে গিয়া এক নম্বর রুজু করিবে,—তবে তাহার নাম শিবু সামন্ত।

ওদিকে শম্ভু বাঁশপাতা-কাড়ার কর্তব্যটা শেষ করিয়াই মনের সুখে হাল গরু লইয়া মাঠে চলিয়া গিয়াছিল। স্ত্রীর নিষেধ শুনে নাই। বাড়িতে ছোটবৌ একা। ইতিমধ্যে ভাশুর

আসিয়া চীৎকারে পাড়া জড় করিয়া বীরদর্পে এক তরফা জয়ী হইয়া চলিয়া গেলেন, ভাদ্রবধূ হইয়া সে সমস্ত কানে শুনিয়াও একটা কথারও জবাব দিতে পারিল না। ইহাতে তাহার মনস্তাপ ও স্বামীর বিরুদ্ধে অভিমানের অবধি রহিল না। সে রান্নাঘরের দিকেও গেল না। বিরস-মুখে দাওয়ার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল।

শিবুর বাড়িতেও সেই দশা। বড়বৌ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বামীর পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। হয় সে ইহার একটা বিহিত করুক, নয় সে জলটুকু পর্যন্ত মুখে না দিয়া বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবে। দু' টা বাঁশপাতার জন্যে দেওরের হাতে এত লাঞ্ছনা !

বেলা দেড় প্রহর হইয়া গেল, তখনও শিবুর দেখা নাই। বড়বৌ ছটফট করিতে লাগিল, কি জানি চৌধুরীমশাইয়ের বাটী হইতেই বা তিনি নম্বর রজু করিতে সোজা সদরে চলিয়া গেলেন।

এমন সময় বাহিরের দরজায় ঝনাৎ করিয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া শম্ভুর বড়ছেলে গয়ারাম প্রবেশ করিল। বয়স তাহার ষোল-সতের, কিংবা এমনি একটা কিছু। কিন্তু এই বয়সেই ক্রোধ এবং ভাষাটা তাহার বাপকেও ডিঙ্গাইয়া গিয়াছিল। সে গ্রামের মাইনর স্কুলে পড়ে। আজকাল মর্নিং-ইস্কুল, বেলা সাড়ে দশটায় ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে।

গয়ারামের যখন এক বৎসর বয়স, তখন জননীর মৃত্যু হয়; তাহার পিতা শম্ভু পুনরায় বিবাহ করিয়া নূতন বধূ ঘরে আনিল বটে, কিন্তু এই মা-মরা ছেলেটিকে মানুষ করিবার দায় জ্যাঠাইমার উপরেই পড়িল এবং এতকাল দুই ভাই পৃথক না হওয়া পর্যন্ত এ ভার তিনিই বহন করিয়া আসিতেছিলেন। বিমাতার সহিত তাহার কোন দিনই বিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না—এমন কি, তাহার নূতন বাড়িতে উঠিয়া যাওয়ার পরেও গয়ারাম যেখানে যেদিন সুবিধা পাইত আহার করিয়া লইত।

আজ সে ইস্কুলের ছুটির পর বাড়ি ঢুকিয়া বিমাতার মুখ এবং আহারের বন্দোবস্ত দেখিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ এ বাড়িতে আসিতেছিল। জ্যাঠাইমার মুখ দেখিয়া তাহার

সেই আগুনে জল পড়িল না, কেরোসিন পড়িল। সে কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল, ভাত দে জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা কথা কহিলেন না, যেমন বসিয়াছিলেন, তেমনি বসিয়া রহিলেন।

ক্রুদ্ধ গয়ারাম মাটিতে একটা পা ঠুকিয়া বলিল, ভাত দিবি, না দিবিনে, তা বল্?

গঙ্গামণি সক্রোধে মুখ তুলিয়া তর্জন করিয়া কহিলেন, তোর জন্যে ভাত রেঁধে বসে আছি–তাই দেব! বলি তোর সৎমা আবাগী ভাত দিতে পারলে না যে এখানে এসেছিস হাঙ্গামা করতে?

গয়ারাম চেঁচাইয়া বলিল, সে আবাগীর কথা জানিনে। তুই দিবি কি না বল্? না দিবি ত চললুম আমি তোর সব হাঁড়িকুঁড়ি ভেঙ্গে দিতে। বলিয়া সে গোলার নীচে চ্যালাকাঠের গাদা হইতে একটা কাঠ তুলিয়া সবেগে রন্ধনশালার অভিমুখে চলিল।

জ্যাঠাইমা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, গয়া ! হারামজাদা দস্যি! বাড়বাড়ি করিস নে বলচি! দু'দিন হয়নি আমি নতুন হাঁড়িকুঁড়ি কেড়েচি, একটা-কিছু ভাঙলে তোর জ্যাঠাকে দিয়ে তোর একখানা পা যদি না ভাঙাই ত তখন বলিস, হাঁ।

গয়ারাম রান্নাঘরের শিকলটায় গিয়া হাত দিয়াছিল, হঠাৎ একটা নূতন কথা মনে পড়ায় সে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা, ভাত না দিস্ না দিবি– আমি চাইনে। নদীর ধারে বটতলায় বামুনদের মেয়েরা সব ধামা ধামা চিঁড়ে-মুড়কি নিয়ে পূজো করচে, যে চাইচে, দিচ্ছে–দেখে এলুম। আমি চললুম তেনাদের কাছে।

গঙ্গামণির তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল, আজ অরণ্যষষ্ঠী, এবং একমুহূর্তেই তাঁহার মেজাজ কড়ি হইতে কোমলে নামিয়া আসিল। তথাপি মুখের জোর রাখিয়া কহিলেন, তাই যা না। কেমন খেতে পাস দেখি !

দেখিস তখন, বলিয়া গয়া একখানা ছেঁড়া গামছা টানিয়া লইয়া সেটা কোমরে জড়াইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই গঙ্গামণি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আজ ষষ্ঠীর দিনে পরের ঘরে চেয়ে খেলে তোর কি দুগ্যতি করি, তা দেখিস হতভাগা !

গয়া জবাব দিল না। রান্নাঘরে ঢুকিয়া এক খামচা তেল লইয়া মাথায় ঘষিতে ঘষিতে বাহির হইয়া যায় দেখিয়া জ্যাঠাইমা উঠানে নামিয়া আসিয়া ভয় দেখাইয়া কহিলেন, দস্যি কোথাকার! ঠাকুরদেবতার সঙ্গে গোঁয়ারতুমি! ডুব দিয়ে ফিরে না এলে ভাল হবে না বলে দিচ্চি। আজ আমি রেগে রয়েচি।

কিন্তু গয়ারাম ভয় পাইবার ছেলে নয়। সে শুধু দাঁত বাহির করিয়া জ্যাঠাইমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

গঙ্গামণি তাহার পিছনে পিছনে রাস্তা পর্যন্ত আসিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন, আজ ষষ্ঠীর দিনে কার ছেলে ভাত খায় যে, তুই ভাত খেতে চাস? পাটালি-গুড়ের সন্দেশ দিয়ে, চাঁপাকলা দিয়ে, দুধদই দিয়ে ফলার করা চলে না যে, তুই যাবি পরের ঘরে চেয়ে খেতে? কৈবর্তের ঘরে তুমি এম্‌নি নবাব জন্মেছ ?

গয়া কিছু দূরে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে তুই দিলিনি কেন পোড়ারমুখি? কেন বললি নেই?

গঙ্গামণি গালে হাত দিয়া অবাক হইয়া বলিলেন, শোন কথা ছেলের! কখন আবার বললুম তোকে, কিছু নেই? কোথায় চান, কোথায় কি, দস্যির মত ঢুকেই বলে—দে ভাত! ভাত কি আজ খেতে আছে যে, দেব! আমি বলি, সবই ত মজুদ, ডুবটা দিয়ে এলেই—

গয়া কহিল, ফলার তোর পচুক। রোজ রোজ আবাগীরা ঝগড়া করে রান্নাঘরের শেকল টেনে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকবে, আর রোজ আমি তিনপোর বেলায় ভাতে ভাত

খাব? যা আমি তোদের কারুর কাছে খেতে চাইনে, বলিয়া সে হনহন করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া গঙ্গামণি সেইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় চেঁচাইতে লাগিলেন, আজ ষষ্ঠীর দিনে কারো কাছে চেয়ে খেয়ে অমঙ্গল করিস নে গয়া, লক্ষ্মী বাপ আমার,—না হয় চারটে পয়সা দেব রে, শোন্—গয়ারাম ভ্রূক্ষেপও করিল না, দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। বলিতে বলিতে গেল, চাইনে আমি ফলার, চাইনে আমি পয়সা। তোর ফলারে আমি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে, গঙ্গামণি বাড়ি ফিরিয়া রাগে, দুঃখে, অভিমানে নির্জীবের মত দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িলেন এবং গয়ার কুব্যবহারে মর্মাহত হইয়া তাহার বিমাতার মাথা খাইতে লাগিলেন।

কিন্তু নদীর পথে চলিতে চলিতে গয়ার জ্যাঠাইমার কথাগুলো কানে বাজিতে লাগিল। একে উত্তম আহারের প্রতি স্বভাবতঃই তাহার একটু অধিক লোভ ছিল। পাটালি- গুড়ের সন্দেশ, দধি, দুগ্ধ, চাঁপাকলা—তাহার উপর চার পয়সা দক্ষিণা—মনটা তাহার দ্রুত নরম হইয়া আসিতে লাগিল।

স্নান সারিয়া গয়ারাম প্রচণ্ড ক্ষুধা লইয়া ফিরিয়া আসিল। উঠানে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, ফলারের সব শিগ্‌গির নিয়ে আয় জ্যাঠাইমা—আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে। কিন্তু পাটালি-সন্দেশ কম দিবি ত আজ তোকেই খেয়ে ফেলব।

গঙ্গামণি সেইমাত্র গরুর কাজ করিতে গোয়ালে ঢুকিয়াছিলেন। গয়ার ডাক শুনিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। ঘরে দুধ দই চিঁড়া গুড় ছিল বটে, কিন্তু চাঁপাকলাও ছিল না, পাটালি-গুড়ের সন্দেশও ছিল না। তখন গয়াকে আটকাইবার জন্য যা মুখে আসিয়াছিল, তাই বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিলেন।

তিনি সেইখান হইতে সাড়া দিয়া কহিলেন, তুই ততক্ষণ ভিজে কাপড় ছাড় বাবা, আমি পুকুর থেকে হাত ধুয়ে আসছি।

শিগ্‌গির আয়, বলিয়া হুকুম চালাইয়া গয়া কাপড় ছাড়িয়া নিজেই একটা আসন পাতিয়া ঘটিতে জল গড়াইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল। গঙ্গামণি তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া আসিয়া তাহার প্রসন্ন মেজাজ দেখিয়া খুশি হইয়া বলিলেন, এই ত আমার লক্ষ্মী ছেলে। কথায় কথায় কি রাগ করতে আছে বাবা! বলিয়া তিনি ভাঁড়ার হইতে আহারের সমস্ত আয়োজন আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

গয়ারাম চক্ষের পলকে উপকরণগুলি দেখিয়া লইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, চাঁপাকলা কৈ?

গঙ্গামণি ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, ঢাকা দিতে মনে নেই বাবা, সব কটা ইঁদুরে খেয়ে গেছে। একটা বেড়াল না পুষলে আর নয় দেখছি।

গয়া হাসিয়া বলিল, কলা কখন ইঁদুরে খায়? তোর ছিল না তাই কেন বল্ না ?

গঙ্গামণি অবাক হইয়া কহিলেন, সে কি কথা রে! কলা ইঁদুরে খায় না ?

গয়া চিঁড়া দই মাখিতে মাখিতে বলিল, আচ্ছা খায়, খায়; কলা আমার দরকার নেই, পাটালি-গুড়ের সন্দেশ নিয়ে আয়। কম আনিস নি যেন।

জ্যাঠাইমা পুনরায় ভাঁড়ারে ঢুকিয়া মিছামিছি কিছুক্ষণ হাঁড়িকুঁড়ি নাড়িয়া সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, যাঃ—এও ইঁদুরে খেয়ে গেছে বাবা, একফোঁটা নেই, কখন মনভুলন্তে হাঁড়ির মুখ খুলে রেখেছি—

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই গয়া চোখ পাকাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, পাটালি-গুড় কখন ইঁদুরে খায় রাক্ষসী? আমার সঙ্গে চালাকি ? তোর যদি কিছু নেই, তবে কেন আমাকে ডাকলি।

জ্যাঠাইমা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, সত্যি বলচি গয়া–

গয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, তবু বলচ সত্যি, যা–আমি তোর কিছু খেতে চাইনি, বলিয়া সে পা দিয়া টান মারিয়া সমস্ত আয়োজন উঠানে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি মজা,–বলিয়া সেই চ্যালা-কাঠটা হাতে তুলিয়া ভাঁড়ারের দিকে ছুটিল।

গঙ্গামণি হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া গিয়া পড়িলেন, কিন্তু চক্ষের নিমিষে ক্রুদ্ধ গয়ারাম হাঁড়িকুঁড়ি ভাঙ্গিয়া জিনিসপত্র ছড়াইয়া একাকার করিয়া দিল। বাধা দিতে গিয়া তিনি হাতের উপর সামান্য একটু আঘাত পাইলেন।

ঠিক এমনি সময়ে শিবু জমিদার-বাটী হইতে ফিরিয়া আসিল। হাঙ্গামা শুনিয়া চীৎকার-শব্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই গঙ্গামণি স্বামীর সাড়া পাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং গয়ারাম হাতের কাঠটা ফেলিয়া দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারিল।

শিবু ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি ?

গঙ্গামণি কাঁদিয়া কহিল, গয়া আমার সর্বস্ব ভেঙ্গে দিয়ে হাতে আমার এক ঘা বসিয়ে দিয়ে পালিয়েছে–এই দেখ ফুলে উঠেছে। বলিয়া সে স্বামীকে হাতটা দেখাইল।

শিবুর পশ্চাতে তার ছোট-সম্বন্ধী ছিল। হুঁশিয়ার এবং লেখাপড়া জানে বলিয়া জমিদার-বাটীতে যাইবার যময় শিবু তাহাকে ও-পাড়া হইতে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে কহিল, সামন্তমশাই, এ সমস্ত ঐ ছোট-সামন্তর কারসাজি। ছেলেকে দিয়ে সে-ই এ কাজ করিয়েছে। কি বল দিদি, এই নয় ?

গঙ্গামণির তখন অন্তর জ্বলিতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ঠিক ভাই। ওই মুখপোড়াই ছোঁড়াকে শিখিয়ে দিয়ে আমাকে মার খাইয়েচে। এর কি করবে তোমরা কর,নইলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

এত বেলা পর্যন্ত শিবুর নাওয়া-খাওয়া নাই, জমিদারের কাছেও সুবিচার হয় নাই, তাহাতে বাড়ি পা দিতে না দিতে এই কাণ্ড, তাহার আর হিতাহিত জ্ঞান রহিল না। সে প্রচণ্ড একটা শপথ করিয়া বলিয়া উঠিল, এই আমি চললুম থানায় দারোগার কাছে। এর বিহিত না করতে পারি ত আমি বিন্দু সামন্তর ছেলে নই।

তাহার শালা লেখাপড়া-জানা লোক, বিশেষতঃ তাহার গয়ার উপর আগে হইতেই আক্রোশ ছিল; সে কহিল, আইন- মতে এর নাম অনধিকার প্রবেশ। লাঠি নিয়ে বাড়ি চড়াও হওয়া, জিনিসপত্র ভাঙা, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা—এর শাস্তি ছ'মাস জেল। সামন্তমশাই, তুমি কোমর বেঁধে দাঁড়াও দেখি, আমি কেমন না বাপ-বেটাকে একসঙ্গে জেলে পুরতে পারি !

শিবু আর দ্বিরুক্তি করিল না, সম্বন্ধীর হাত ধরিয়া থানার দারোগার উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

গঙ্গামণির সকলের চেয়ে বেশী রাগ পড়িয়াছিল দেবর ও ছোটবধূর উপর। সে এই লইয়া একটা হুলস্থূল করিবার উদ্দেশ্যে কবাটে শিকল তুলিয়া দিয়া সেই চ্যালাকাঠ হাতে করিয়া সোজা শম্ভুর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। উচ্চকণ্ঠে কহিল, কেমন গো ছোটকর্তা, ছেলেকে দিয়ে আমাকে মার খাওয়াবে ? এখন বাপ- বেটায় একসঙ্গে ফাটকে যাও!

শম্ভু সেইমাত্র তাহার এ-পক্ষের ছেলেটাকে লইয়া ফলার শেষ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, বড়ভাজের মূর্তি এবং তাহার হাতের চ্যালা-কাঠটা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কহিল, হয়েচে কি? আমি ত কিছুই জানিনে!

গঙ্গামণি মুখ বিকৃত করিয়া জবাব দিল, আর ন্যাকা সাজতে হবে না। দারোগা আসচে, তার কাছে গিয়ে ব’লো,–কিছুই জান কি না।

ছোটবৌ ঘর হইতে বাহির হইয়া একটি খুঁটি ঠেস দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল, শম্ভু মনে মনে ভয় পাইয়া কাছে আসিয়া গঙ্গামণির একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, মাইরি বলচি বড়বৌঠান, আমরা কিছুই জানিনে।

কথাটা যে সত্য, বড়বৌ তাহা নিজেও জানিত, কিন্তু তখন উদারতার সময় নয়। সে শম্ভুর মুখের উপরেই ষোল আনা দোষ চাপাইয়া–সত্যমিথ্যায় জড়াইয়া গয়ারামের কীর্তি বিবৃত করিল। এই ছেলেটাকে যাহারা জানে, তাহাদের পক্ষে ঘটনাটা অবিশ্বাস করা শক্ত।

স্বল্পভাষিণী ছোটবৌ এতক্ষণে মুখ খুলিল; স্বামীকে কহিল, ক্যামন, যা বলেছিনু তাই হ’লো কি না–কতদিন বলি, ওগো, দস্যি ছোঁড়াটাকে আর ঘরে ঢুকতে দিয়োনি, তোমার ছোট ছেলেটাকে হক্ না-হক্ মেরে মেরে কোন্‌দিন খুন করে ফেলবে। তা গেরাহ্যিই হয় না–এখন কথা খাটল ত?

শম্ভু অনুনয় করিয়া গঙ্গামণিকে কহিল, আমার দিব্যি বড়বৌঠান, দাদা সত্যি নাকি থানায় গেছে ?

তাহার করুণ কণ্ঠস্বরে কতকটা নরম হইয়া বড়বৌ জোর দিয়া বলিল, তোমার দিব্যি ঠাকুরপো, গেছে, সঙ্গে আমাদের পাঁচুও গেছে।

শম্ভু অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। ছোটবৌ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, নিত্যি বলি দিদি, কোথায় যে নদীর ওপর সরকারী পুল হচ্ছে, কত লোক খাটতে যাচ্ছে, সেথায় নিয়ে গিয়ে ওরে কাজে লাগিয়ে দাও। তারা চাবুক মারবে আর কাজ করাবে–পালাবার জোটি নেই–দু’দিনে সোজা হয়ে যাবে। তা না–ইস্কুলে দিয়েচি পড়ুক! ছেলে যেন ওঁর উকিল মোক্তার হবে।

শম্ভু কাতর হইয়া বলিল, আরে সাধে দিইনি সেখানে! সবাই কি ঘরে ফিরতে পায়, আদ্ধেক লোক মাটি চাপা হয়ে কোথায় তলিয়ে যায়, তার তল্লাশই মেলে না।

ছোটবৌ বলিল, তবে বাপ-ব্যাটাতে মিলে ফাটকে খাট গে যাও।

বড়বৌ চুপ করিয়া রহিল। শম্ভু তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল, আমি কালই ছোঁড়াকে নিয়ে গিয়ে পাঁচ্‌লার পুলে কাজে লাগিয়ে দেব, বৌঠান, দাদাকে ঠাণ্ডা কর। আর এমন হবে না।

তাহার স্ত্রী কহিল, ঝগড়াঝাঁটি ত শুধু ঐ ড্যাক্‌রার জন্যে। তোমাকেও ত কতবার বলিচি দিদি, ওরে ঘরেদোরে ঢুকতে দিও না—আশকারা দিও না। আমি বলিনে তাই, নইলে ও-মাসে তোমাদের মর্তমান কলার কাঁদিটে রাত্তিরে কে কেটে নিয়েছিল? সে ত ঐ দস্যি। যেমন কুকুর তেমন মুগুর না হলে কি চলে? পুলের কাজে পাঠিয়ে দাও, পাড়া জুড়ুক।

শম্ভু মাতৃদিব্য করিল যে, কাল যেমন করিয়া হোক ছোঁড়াকে গ্রাম-ছাড়া করিয়া তবে সে জল-গ্রহণ করিবে।

গঙ্গামণি এ কথাতেও কোন কথা কহিল না, হাতের কাঠটা ফেলিয়া দিয়া নিঃশব্দে বাড়ি ফিরিয়া গেল।

স্বামী, ভাই এখনও অভুক্ত। অপরাহ্নবেলায় সে বিষণ্ণ-মুখে রান্নাঘরের দোরে বসিয়া তাহাদেরই খাবার আয়োজন করিতেছিল, গয়ারাম উঁকিঝুঁকি মারিয়া নিঃশব্দ-পদে প্রবেশ করিল। বাটীতে আর কেহ নাই দেখিয়া সে সাহসে ভর করিয়া একেবারে পিছনে আসিয়া ডাক দিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। গয়ারাম অদূরে ক্লান্তভাবে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, আচ্ছা, যা আছে তাই দে, আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে।

খাবার কথায় গঙ্গামণির শান্ত ক্রোধ মুহূর্তে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাহার মুখের প্রতি না চাহিয়াই সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, বেহায়া! পোড়ারমুখো! আবার আমার কাছে এসেচিস ক্ষিদে বলে? দূর হ এখান থেকে।

গয়া বলিল, দূর হব তোর কথায়?

জ্যাঠাইমা ধমক দিয়া কহিলেন, হারামজাদা নচ্ছার! আমি আবার দোব তোকে খেতে?

গয়া বলিল, তুই দিবিনি ত কে দেবে? কেন তুই ইঁদুরের দোষ দিয়া মিছে কথা বললি? কেন ভাল করে বললি নি, বাবা, এই দিয়ে খা, আজ আর কিছু নেই! তা হলে ত আমার রাগ হয় না। দে না খেতে শিগ্‌গির রাক্ষুসী, আমার পেট যে জ্বলে গেল!

জ্যাঠাইমা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, মনে মনে একটু নরম হইয়া বলিলেন, পেট জ্বলে থাকে তোর সৎমার কাছে যা।

বিমাতার নামে গয়া চক্ষের পলকে আগুন হইয়া উঠিল। বলিল, সে আবাগীর নাকি আমি আর মুখ দেখব? শুধু ঘরে আমার ছিপটা আনতে গেছি, বলে, দূর! দূর! এইবার জেলের ভাত খে গে যা! আমি বললুম, তোদের ভাত আমি খেতে আসিনি–আমি জ্যাঠাইমার কাছে যাচ্চি। পোড়ারমুখী কম শয়তান! ঐ গিয়ে লাগিয়েচে বলেই ত বাবা তোর হাত থেকে বাঁশপাতা কেড়ে নিয়েচে! বলিয়া সে সজোরে মাটিতে একটা পা তুলিয়া কহিল, তুই রাক্ষুসী নিজে পাতা আনতে গিয়ে অপমান হলি? কেন আমায় বললি নি? ঐ বাঁশঝাড় সমস্ত আমি যদি না আগুন দিয়ে পোড়াই ত আমার নাম গয়া নয়, তা দেখিস!

আবাগী আমাকে বললে কি জানিস জ্যাঠাইমা? বলে, তোর জ্যাঠাইমা থানায় খবর পাঠিয়েচে, দারোগা এসে বেঁধে নিয়ে তোকে জেলে দেবে। শুনলি কথা হতভাগীর?

গঙ্গামণি কহিলেন, তোর জ্যাঠামশাই পাঁচুকে সঙ্গে নিয়ে গেছেই ত থানায়। তুই আমার গায়ে হাত তুলিস—এতবড় তোর আস্পদ্দা!

পাঁচুমামাকে গয়া একেবারে দেখিতে পারিত না। সে আবার যোগ দিয়াছে শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কেন তুই রাগের সময় আমায় আটকাতে গেলি?

গঙ্গামণি বলিলেন, তাই আমাকে মারবি? এখন যা ফাটকে বাঁধা থাক্ গে যা।

গয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল, ইঃ—তুই আমাকে ফাটকে দিবি? দে না, দিয়ে একবার মজা দেখ্ না! আপনি কেঁদে কেঁদে মরে যাবি—আমার কি হবে!

গঙ্গামণি কহিলেন, আমার বয়ে গেছে কাঁদতে! যা আমার সুমুখ থেকে যা বলচি, শত্তুর বালাই কোথাকার!

গয়া চেঁচাইয়া কহিল, তুই আগে খেতে দে না, তবে ত যাব। কখন সাত-সকালে দুটি মুড়ি খেয়েচি বল্ ত? ক্ষিদে পায় না আমার?

গঙ্গামণি কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শিবু পাঁচুকে লইয়া থানা হইতে ফিরিয়া আসিল এবং গয়ার প্রতি চোখ পড়িবামাত্রই বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া চীৎকার করিল, হারামজাদা পাজী, আবার আমার বাড়ি ঢুকেছে! বেরো, বেরো বলচি! পাঁচু, ধর্ ত শুয়োরকে!

বিদ্যুদ্বেগে গয়ারাম দরজা দিয়া দৌড় মারিল। চেঁচাইয়া বলিয়া গেল—পেঁচোশালার একটা ঠ্যাং না ভেঙ্গে দিই ত আমার নামই গয়ারাম নয়।

চক্ষের পলকে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল। গঙ্গামণি একটা কথা কহিবারও অবকাশ পাইল না।

ক্রুদ্ধ শিবু স্ত্রীকে বলিল, তোর আসকারা পেয়েই ও এমন হচ্চে। আর যদি কখন হারামজাদাকে বাড়ি ঢুকতে দিস্ ত তোর অতি বড় দিব্য রইল।

পাঁচু বলিল, দিদি, তোমাদের কি, আমারই সর্বনাশ। কখন রাত-ভিতে লুকিয়ে আমার ঠ্যাঙেই ও ঠ্যাঙা মারবে দেখচি।

শিবু কহিল, কাল সকালেই যদি না পুলিশ-পেয়াদা দিয়ে ওর হাতে দড়ি পরাই ত আমার–ইত্যাদি ইত্যাদি।

গঙ্গামণি কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল–একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। ভীতু পাঁচকড়ি সে রাত্রে আর বাড়ি গেল না। এইখানে শুইয়া রহিল।

পরদিন বেলা দশটার সময় ক্রোশ-দুই দূরের পথ হইতে দারোগাবাবু উপযুক্ত দক্ষিণাদি গ্রহণ করিয়া পালকি চড়িয়া কনস্টেবল ও চৌকিদারাদি সমভিব্যাহারে সরজমিনে তদন্ত করিতে উপস্থিত হইলেন। অনধিকার প্রবেশ, জিনিসপত্র তছ্‌রুপাত, চ্যালা-কাঠের দ্বারা স্ত্রীলোকের অঙ্গে প্রহার–ইত্যাদি বড় বড় ধারার অভিযোগ–সমস্ত গ্রামময় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

প্রধান আসামী গয়ারাম–তাহাকে কৌশলে ধরিয়া আনিয়া হাজির করিতেই, সে কনস্টেবল চৌকিদার প্রভৃতি দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে কেউ দেখতে পারে না বলে আমাকে ফাটকে দিতে চায়।

দারোগা বুড়ামানুষ। তিনি আসামীর বয়স এবং কান্না দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কেউ ভালবাসে না গয়ারাম?

গয়া কহিল, আমাকে শুধু আমার জ্যাঠাইমা ভালবাসে, আর কেউ না।

দারোগা প্রশ্ন করিল, তবে জ্যাঠাইমাকে মেরেচ কেন?

গয়া বলিল, না, মারিনি। কবাটের আড়ালে গঙ্গামণি দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইদিকে চাহিয়া কহিল, তোকে আমি কখন মেরেচি জ্যাঠাইমা?

পাঁচু নিকটে বসিয়াছিল, সে একটু কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, দিদি, হুজুর জিজ্ঞেসা করচেন, সত্যি কথা বল। ও কাল দুপুরবেলা বাড়ি চড়াও হয়ে—কাঠের বাড়ি তোমাকে মারেনি? ধর্মাবতারের কাছে যেন মিথ্যা কথা ব'লো না।

গঙ্গামণি অস্ফুটে যাহা কহিলেন, পাঁচু তাহাই পরিস্ফুট করিয়া বলিল, হাঁ হুজুর, আমার দিদি বলচেন, ও মেরেচে।

গয়া অগ্নিমূর্তি হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, দ্যাখ্ পেঁচো, তোর আমি না পা ভাঙ্গি ত—রাগে কথাটা তার সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, কাঁদিয়া ফেলিল।

পাঁচু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, দেখলেন হুজুর! দেখলেন! হুজুরের সুমুখেই বলচে পা ভেঙ্গে দেবে—আড়ালে ও খুন করতে পারে। ওকে বাঁধবার হুকুম হোক।

দারোগা শুধু একটু হাসিলেন। গয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, আমার মা নেই তাই। নইলে—এ বারেও কথাটা তাহার শেষ হইতে পারিল না। যে মাকে তাহার মনেও নাই, মনে করিবার কখনও প্রয়োজনও হয় নাই, আজ বিপদের দিনে অকস্মাৎ তাঁহাকেই ডাকিয়া সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দ্বিতীয় আসামী শম্ভুর বিরুদ্ধে কোন কথাই প্রমাণ হইল না। দারোগাবাবু আদালতে নালিশ করিবার হুকুম দিয়া রিপোর্ট লিখিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। পাঁচু মামলা চালানো,

তাহার যথারীতি তদ্বিরাদির দায়িত্ব গ্রহণ করিল এবং তাহার ভগিনীর প্রতি গুরুতর অত্যাচারের জন্য গয়ার যে কঠিন শাস্তি হইবে, এই কথা চতুর্দিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু গয়া সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। পাড়া-প্রতিবেশীরা শিবুর এই আচরণে অত্যন্ত নিন্দা করিতে লাগিল। শিবু তাহাদের সহিত লড়াই করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু শিবুর স্ত্রী একেবারে চুপচাপ।

সেদিন গয়ার দূর-সম্পর্কের এক মাসি খবর শুনিয়া শিবুর বাড়ি বহিয়া তাহার স্ত্রীকে যা ইচ্ছা তাই বলিয়া গালিগালাজ করিয়া গেল, কিন্তু গঙ্গামণি একেবারে নির্বাক হইয়া রহিল।

শিবু পাশের বাড়ির লোকের কাছে এ কথা শুনিয়া রাগ করিয়া স্ত্রীকে কহিল, তুই চুপ করে রইলি? একটা কথাও বললি নে?

শিবুর স্ত্রী কহিল, না।

শিবু বলিল, আমি বাড়ি থাকলে মাগীকে ঝাঁটাপেটা করে ছেড়ে দিতুম।

তাহার স্ত্রী কহিল, তা হলে আজ থেকে বাড়িতেই বসে থেকো, আর কোথাও বেরিও না। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

সেদিন দুপুরবেলায় শিবু বাড়ি ছিল না। শম্ভু আসিয়া বাঁশঝাড় হইতে গোটা-কয়েক বাঁশ কাটিয়া লইয়া গেল। শব্দ শুনিয়া শিবুর স্ত্রী বাহিরে আসিয়া স্বচক্ষে সমস্ত দেখিল, কিন্তু বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, আজ সে কাছেও ঘেঁষিল না, নিঃশব্দে ঘরে ফিরিয়া গেল। দিন-দুই পরে সংবাদ শুনিয়া শিবু লাফাইতে লাগিল। স্ত্রীকে আসিয়া কহিল, তুই কি

কানের মাথা খেয়েচিস? ঘরের পাশ থেকে সে বাঁশ কেটে নিয়ে গেল, আর তুই টের পেলিনি?

তাহার স্ত্রী বলিল, কেন টের পাব না, আমি চোখেই ত সব দেখিচি!

শিবু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তবু আমাকে তুই–জানালি নে?

গঙ্গামণি বলিল, জানাব আবার কি? বাঁশঝাড় কি তোমার একার? ঠাকুরপোর তাতে ভাগ নেই?

শিবু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া শুধু কহিল, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

সেদিন সন্ধ্যার পর পাঁচু সদর হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রান্তভাবে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। শিবু গরুর জন্য খড় কুচাইতেছিল, অন্ধকারে তাহার মুখের চোখের চাপা হাসি লক্ষ্য করিল না–সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'লো ?

পাঁচু গাম্ভীর্যের সহিত একটু হাস্য করিয়া কহিল, পাঁচু থাকলে যা হয় তাই! ওয়ারিন্ বের করে তবে আসচি। এখন কোথায় আছে জানতে পারলেই হয়।

শিবুর কি-একপ্রকার ভয়ানক জিদ চড়িয়া গিয়াছিল। সে কহিল, যত খরচ হোক, ছোঁড়াকে ধরাই চাই। তাকে জেলে পুরে তবে আমার অন্য কাজ। তার পরে উভয়ের নানা পরামর্শ চলিতে লাগিল। কিন্তু রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল, ভিতর হইতে আহারের আহ্বান আসে না দেখিয়া, শিবু আশ্চর্য হইয়া রান্নাঘরে গিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার।

শোবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, স্ত্রী মেজের উপর মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছে। ক্রুদ্ধ এবং আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাবার হয়ে গেছে ত আমাদের ডাকিস নি কেন?

গঙ্গামণি ধীরে সুস্থে পাশ ফিরিয়া বলিল, কে রাঁধলে যে খাবার হয়ে গেছে?

শিবু তর্জন করিয়া প্রশ্ন করিল, রাঁধিস নি এখনো?

গঙ্গামণি কহিল, না। আমার শরীর ভাল নেই, আজ আমি পারব না।

নিদারুণ ক্ষুধায় শিবুর নাড়ী জ্বলিতেছিল, সে আর সহিতে পারিল না। শায়িত স্ত্রীর পিঠের উপর একটা লাথি মারিয়া বলিল, আজকাল রোজ অসুখ, রোজ পারব না! পারবি নে ত বেরো আমার বাড়ি থেকে।

গঙ্গামণি কথাও কহিল না, উঠিয়াও বসিল না। যেমন শুইয়াছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল। সে রাত্রে শালা-ভগিনীপতি কাহারও খাওয়া হইল না।

সকালবেলা দেখা গেল, গঙ্গামণি বাটীতে নাই। এদিকে ওদিকে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর পাঁচু কহিল, দিদি নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ি চলে গেছে।

স্ত্রীর এইপ্রকার আকস্মিক পরিবর্তনের হেতু শিবু মনে মনে বুঝিয়াছিল বলিয়া তাহার বিরক্তিও যেমন উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, নালিশ মকদ্দমার প্রতি ঝোঁকও তেমনি খাটো হইয়া আসিতেছিল। সে শুধু বলিল, চুলোয় যাক, আমার খোঁজবার দরকার নেই।

বিকালবেলা খবর পাওয়া গেল, গঙ্গামণি বাপের বাড়ি যায় নাই। পাঁচু ভরসা দিয়া কহিল, তা হলে নিশ্চয় পিসীমার বাড়ি চলে গেছেন।

তাহাদের এক বড়লোক পিসী ক্রোশ পাঁচ-ছয় দূরে একটা গ্রামে বাস করিতেন। পূজা-পর্ব উপলক্ষে তিনি মাঝে মাঝে গঙ্গামণিকে লইয়া যাইতেন। শিবু স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সে মুখে বলিল বটে, যেখানে খুশি যাক গে! মরুক গে! কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনুতপ্ত এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তবুও রাগের উপর দিন পাঁচ-ছয় কাটিয়া গেল।

এদিকে কাজকর্ম লইয়া, গরু-বাছুর লইয়া সংসার তাহার একপ্রকার অচল হইয়া উঠিল। একটা দিনও আর কাটে না এমনি হইল।

সাতদিনের দিন সে আপনি গেল না বটে, কিন্তু নিজের পৌরুষ বিসর্জন দিয়া পিসীর বাড়িতে গরুর গাড়ি পাঠাইয়া দিল।

পরদিন শূন্য গাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল সেখানে কেহ নাই। শিবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

সারাদিন স্নানাহার নাই, মড়ার মত একটা তক্তপোশের উপর পড়িয়াছিল, পাঁচু অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢুকিয়া কহিল, সামন্তমশাই, সন্ধান পাওয়া গেছে।

শিবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, কোথায়? কে খবর দিলে? অসুখ-বিসুখ কিছু হয়নি ত? গাড়ি নিয়ে চল্ না এখুনি দু'জনে যাই।

পাঁচু বলিল, দিদির কথা নয়—গয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে।

শিবু আবার শুইয়া পড়িল, কোন কথা কহিল না।

তখন পাঁচু বহুপ্রকারে বুঝাইতে লাগিল যে, এ সুযোগ কোনও মতে হাতছাড়া করা উচিত নয়। দিদি ত একদিন আসবেই, কিন্তু তখন আর এ-ব্যাটাকে বাগে পাওয়া যাবে না।

শিবু উদাসকণ্ঠে বলিল, এখন থাক গে পাঁচু! আগে সে ফিরে আসুক—তার পরে—

পাঁচু বাধা দিয়া কহিল, তার পরে কি আর হবে সামন্তমশাই? বরঞ্চ দিদি ফিরে আসতে না আসতে কাজটা শেষ করা চাই। সে এসে পড়লে হয়ত আর হবেই না।

শিবু রাজী হইল। কিন্তু আপনার খালি ঘরের দিকে চাহিয়া পরের উপর প্রতিশোধ লইবার জোর আর সে কোনমতেই নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এখন পাঁচুর জোর ধার করিয়াই তাহার কাজ চলিতেছিল।

পরদিন রাত্রি থাকিতেই তাহারা আদালতের পেয়াদা প্রভৃতি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। পথে পাঁচু জানাইল, বহু দুঃখে খবর পাওয়া গেছে, শম্ভু তাহাকে পাঁচলার সরকারী পুলের কাজে নাম ভাঁড়াইয়া ভর্তি করিয়া দিয়াছে—সেইখানেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।

শিবু বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, তখনও চুপ করিয়া রহিল।

তাহারা গ্রামে যখন প্রবেশ করিল, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। গ্রামের একপ্রান্তে প্রকাণ্ড মাঠ, লোকজন, লোহা-লক্কড়, কল-কারখানায় পরিপূর্ণ—সর্বত্রই ছোট ছোট ঘর বাঁধিয়া জনমজুরেরা বাস করিতেছে—অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর একজন কহিল, যে ছেলেটি সাহেবের বাংলা লেখাপড়ার কাজ করচে, সে ত? তার ঘর ঐ যে—বলিয়া একখানা ক্ষুদ্র কুটীর দেখাইয়া দিলে, তাহারা গুঁড়ি মারিয়া পা টিপিয়া অনেক কষ্টে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে গয়ারামের গলা শুনিতে পাওয়া গেল। পাঁচু পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া পেয়াদা এবং শিবুকে লইয়া বীরদর্পে অকস্মাৎ কুটীরের উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইবামাত্রই তাহার সমস্ত মুখ বিস্ময়ে, ক্ষোভে, নিরাশায় কালো হইয়া গেল। তাহার দিদি ভাত বাড়িয়া দিয়া একটা হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতেছে এবং গয়ারাম ভোজনে বসিয়াছে।

শিবুকে দেখিতে পাইয়া গঙ্গামণি মাথায় আঁচলটা তুলিয়া দিয়া শুধু কহিল, তোমরা একটু জিরিয়ে নিয়ে নদী থেকে নেয়ে এসো গে, আমি ততক্ষণ আর এক হাঁড়ি ভাত চড়িয়ে দিই।